সমকালীন দৃষ্টিতে জমিদারি, কৃষকসমাজ ও রবীন্দ্রনাথ

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

জমিদারি পরিচালনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত কর্ম না; নিতান্তই পারিবারিক দায়পালন। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে তিনি নিজের কৃত্রিমরূপ ও ভূমিকাটি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন ?

"সকালে উঠে লিখছিলুম...এমৎকালে...রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী মৃদুস্বরে বললেন, একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কি করা যায় লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল—সেখানে ঘন্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য ও অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়।

প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, আমলারা বিনীত করজোরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্তলোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভাব করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙল-ঘরকন্নাওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলে জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।....কি জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে। Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানতো, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।

ব্রিটিশ শোষণের যাঁতাকলে ভারতের মানুষের মন ও প্রাণ কীভাবে নিরস্ত ও ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে পড়ছে তার উপলব্ধি এই গ্রামীণ প্রজাসাধারণের সংস্পর্শে এসেই কবির হয়েছিল। অন্তরে অন্তরে কবি এদের সমমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

ব্রিটিশের ভয়াবহ শোষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"ভারতে যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্টমাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষির শিক্ষার স্বাস্থ্যের সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালা ডোবার মতো হাঁ করে রইলো, বিদেশগামী মুনাফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল। যা গেল তা নিঃশেষে গেল...অতীতকালের ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন বৃটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে যাচ্ছে তার অঙ্ক

Society Language and Culture

সংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশে রক্তহীন দেহ মন চাপা পড়ে গেছে। জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাইরে মরছি।"

১৮৯০ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বিশেষ করে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল পল্লি উন্নয়নের সংগঠক এক মানুষ । ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য জমিদারের মতো তিনি absentee landlord ছিলেন না, নিবিড়ভাবে মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিলেন। গ্রামের বিশেষ করে কৃষক সমাজের ভালবাসা যেমন তিনি পেয়েছিলেন তাদের প্রতি তার কর্তব্যও তিনি সাধ্যমত সম্পাদন করেছিলেন, যা সে সময়ের আর কোনও জমিদারের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। চাষির শ্রম ও দানে যে জমিদারের বাঁচামরার মতো করে আর কোন জমিদার স্বীকার করেছেন? তার কথনে এমনই একটি স্বীকৃতি:

"একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। একবার মাঠের মাঝখান দিয়ে পাল্কীতে চলেছি, দুপুরের প্রচণ্ড রোদে চাষিরা ক্ষেতে কাজ করছে। পাল্কীতে বসে বসে বোধহয় ক্ষণিকা'র কবিতা লিখছি,—একটা লোক মাঠের মাঝখানে কাজ করছিল, হঠাৎ হৈ হৈ করে ছুটে এসে পাল্কী থামাল। আমি বললুম, কি চাস? সে বললে, একটু দাঁড়া। দাঁড়াব কী, আমার গাড়ির সময় হয়ে যাবে যে, সে কি শোনে? বলে একটুখানি দাঁড়া না। রইলুম পাল্কী থামিয়ে, সে ক্ষেতের মধ্যে আঁকাবাঁকা আলের পথ ধরে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে একটা টাকা আমার পায়ের কাছে রাখলে। আমি বল্লুম, এর কি প্রয়োজন ছিল? কেন শুধু শুধু এজন্য আমায় দাঁড় করালি? সে বলে— দেব না, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি? আমার ভারী মিষ্টি লাগল তার এমন সহজ করে সত্যি কথা বলা। তাই মনে আছে আজ পর্যন্ত,—আমরা না দিলে তোরা খাবি কি?"

Society Language and Culture

আবার জমিদার হিসেবে তাদের যে কর্তব্য সে সম্পর্কেও চমৎকারভাবে বলেছেন জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে:

"তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণও যদি বাঁচিয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষীর টাকা এবং এই চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং খেয়ে বহন করছে। এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে। অনাহার থেকে দেশের লোককে যথাসম্ভব বাঁচানোই তোমাদের জীবনের ব্রত হবে। এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয় তাও স্বীকার করতে হবে।"

পল্লি বাংলার সমস্যা যে কত গভীর তার একটি বক্তৃতায় তা সুস্পষ্ট:

"মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক। এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।...তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর,

তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল। অথচ দেশের অধিকাংশ তারা। সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনা অনালোকিত।... দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়। যখন দেশকে 'মা' বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচবো? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?"

গ্রাম-সমাজের এমন সত্য-চিত্র সমকালের কোনো রাজনৈতিক নেতার মুখেও শোনা যায়নি, এমনকি গান্ধি-চিত্তরঞ্জনের মুখেও নয়। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের মুখে গ্রাম সমাজের বা আর্থিক দিক দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে যে শ্রেণি-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথে তার পূর্বগামিতা লক্ষ করা যাবে। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে তিনি মন্তব্য করছেন: 'মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান, সে সভ্যতা মানুষখাদক। তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমনকি তার সংস্কৃতির উপরে মাথা তাোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের ওপর চড়ে, এই নিয়মেই ইউরোপে শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে...দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না।"